চরকা বুড়ী

ননীগোপাল চক্রবর্তী

তুতুল, হাসনুবানু, লবু-কুশু, বাবুন-মিঠুন,
ঝুম্পা, বাপ্পা, সন্তু ও ডিংকু বাবুকে—

—ভাইয়া

চরকা উঠে গেছে দেশ থেকে।
চরকা বুড়ীও এখন চুপ!
নেই ঠাকুরমা, দিদিমার দল,
নেই একান্নবর্তী পরিবার।
ছোট ছেলেমেয়েদের চাহিদা মেটাবে কে?
কে তাদের—তাদের মত ক'রে
গল্প বলবে?
তাই চরকা বুড়ীর ঝুলি থেকে
গল্পগুলো বের করে আনা হ'ল।
আশা করি এখনকার ছেলেমেয়েরা
চরকা বুড়ীর কালের একটা
আমেজ পাবে গল্পগুলিতে।

গেট রোড,
কৃষ্ণনগর।

—লেখক

এতে আছে :

পৃষ্ঠা

চরকা বুড়ী

চরকা বুড়ী গুড়ি গুড়ি
হাঁটে লাঠি নিয়ে।
কেউ জানে না কোন্ জন্মে কার সাথে তার
হয়েছিল বিয়ে!

অথচ তার বিয়ের কথায় বুড়ী পঞ্চমুখ!

একশোজন লাঠিয়াল নিয়ে বর এলো তাকে বিয়ে করতে। তাদের হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

গাঁয়ের মোড়ল ছিল বুড়ীর বাবা। সকলে একজোটে বলল,—এত লাঠিয়াল নিয়ে বিয়ে করতে আসা মানে মোড়লকে ভয় দেখানো। এটা মোড়লের অপমান, গাঁয়েরও একটা নিন্দে। কেন? আমরা কি বেঁচে নেই? আমাদের ঘরেও কি লাঠি নেই?

কি করা যায়!

মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল। অমনি জড়ো হ'য়ে গেল দুশো লাঠিয়াল সেই রাতেই। তাদের মাথায় লাল গামছা। গোঁফে চাড়া দিয়ে লাঠি হাতে লাইন করে তারা দাঁড়িয়ে গেল।

বিয়ে বাড়ী খুব হৈ চৈ। খাওয়া-দাওয়া, বাজি-বাজনা।

পথ চলতি ভিন গাঁয়ের একটি লোক জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপার কি? এত লাঠিয়াল কেন? উত্তর হলো, মোড়ল মশায়ের বাড়ী বিয়ে।

বিয়ে হচ্ছে কার সাথে?

কে একজন উত্তর করল, মোড়ল মশায়ের মেয়ের সাথে।

বরের বাবা একথা শুনে মহাখাপ্পা। বলে, কভি নেহি বিয়ে হচ্ছে আমার ছেলের সাথে।

মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে হচ্ছে, না ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে প্রশ্নটা দাঁড়াল এই।

ঝাঁকড়া-চুল পালোয়ানরা বলে, ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে। মাথায় লাল গামছা লাঠিয়ালরা বলে, মেয়ের সাথেই ছেলের বিয়ে হ'চ্ছে।

মহা হট্টগোল।

মন্তর পড়তে পড়তে পুরুত ঠাকুর থেমে গেলেন। বর পক্ষের

দাবী,—আগে বিচার হোক্ কার সাথে কার বিয়ে হচ্ছে, তারপর বিয়ে।

ডাক পড়ল বড় বড় মাথাওয়ালা লোকের। তাঁরা তুপুর রাত অবধি শাস্ত্র ঘেঁটে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর বললেন,—তু'জনেরই সাথে বিয়ে হচ্ছে।

কিন্তু বরের বাবা তাতে খুশী নয়। এ হতেই পারে না। মেয়েছেলে কি বেটাছেলেকে বিয়ে করতে পারে নাকি? পুরুষের

উপর দিয়ে যাবে মেয়ে! তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলল,—আমার ছেলে যদি বাপকা বেটা হয় তা হলে এখনই—

বরপক্ষের একশো লাঠিয়াল অমনি মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় লাল গামছা-বাঁধা দু'শো লাঠিয়াল গর্জে উঠল,—এখনই কি ?

বরপক্ষের পালোয়ানরা বলে—বিয়ের আসর থেকে জোর করে নিয়ে যাবো মেয়েকে—

কন্যাপক্ষের লাঠিয়ালরা বলে—ঝাঁকড়াচুলো মাথাগুলো সব রেখে দেবো এখানে।

কথা কাটাকাটি, তারপর লাঠালাঠি। বেঁধে গেল দাঙ্গা। তুমুল কাণ্ড।

কুটুম্বরা ছাতি ফেলে পালাল, নিমন্ত্রিতেরা খালি পেটে পালাল, রান্নার লোক উনুন ফেলে পালাল। ঢাকি তার ঢাক ফেলে পালাল, শানাইওয়ালা শানাই ফেলে পালাল, পুরুত গামছা ফেলে পালাল, এয়োরা বরণ ডালা ফেলে পালাল।

ভোর হয়ে গেল।

গাঁয়ের আর আর পাঁচজনের চেষ্টায় দাঙ্গা থামলে যারা যারা পালিয়েছিল সবাই ফিরে এল,—এল না কেবল বর আর কনে।

খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ—কোথায়ও তাদের হদিশ মিলল না, একেবারে বেপাত্তা!

বরের বাবা মেয়ের বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বেয়াই, আমার ছেলে তোমার মেয়ের সাথেই গেছে কোথায় চলে! মেয়ের বাবা ছেলের বাবার গলা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, বিয়াই গো, আমার মেয়ে তোমার ছেলের সাথেই গেছে কোথায় পালিয়ে।

কার সাথে কে গেল ঠিক হলো না কিছু।

এই হচ্ছে চরকাবুড়ীর বিয়ের ইতিহাস। বুড়ী যেন একটা গল্পের ঝুলি! চরকা কাটে আর গল্প বলে। ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে ধরে। তারা একমনে গল্প শোনে আর তুলোর বীজ ছাড়ায়।

রাত্রে বুড়ীর ভালো ঘুম হয় না। শুয়ে শুয়ে বুড়ী রোজ রাত্তিরে তার গল্পের মুসাবিদা করে রাখে, সকালেই তা বলতে হবে ছেলেমেয়েদের: এক গাঁয়ে ছিল তিন জন ঠক। তারা ফাঁকি দিয়ে লোকের জিনিষপত্তোর নিয়ে নিত। তারা সবাই নিজেকে সব চাইতে বড় চালাক মনে করত। এই নিয়ে তাদের ঝগড়া হ'ল একদিন। একদিন গেল তারা তাদের গুরুর কাছে—কে বড় চালাক তাই জানতে। গুরু বলল, কাজ না দেখে কি বলা যায়! তোমরা বেরিয়ে পড়, কে কি বাগালে আমাকে এনে দাও। সব শুনে তবেই তো আমি বলব, কে বড় চালাক?

ঠকেরা বেরিয়ে পড়ল একসঙ্গে।

কতদূর গিয়ে এক মাঠের মধ্যে তারা দেখে, গাধার পিঠে চড়ে একটি লোক যাচ্ছে। তার সঙ্গে আছে একটি রামছাগল। তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ছাগলের দড়ি গাধার লেজের সঙ্গে আটকানো। ছাগলটি গাধার পিছন পিছন হাঁটছে আর ঠুন্ ঠুন্ করে ঘণ্টা বাজছে। প্রথম ঠক বলল, আমি ওর ছাগলটাকে চুরি করব। দ্বিতীয় ঠক বলল, আমি ওর গাধাটাকে বাগিয়ে নেবো। তৃতীয় ঠক বলল, আমি ওর পরণের কাপড়খানি লোপাট করব।

এদিকে এক চোর বুড়ীর ঘরে চুরি করতে এসে একমনে তার সেই সব গল্প শোনে। তারপর কি হলো, পরণের কাপড়খানি কি ভাবে লোপাট করল জানবার জন্য, চুরি করার কথা সে ভুলেই যায়।

এদিকে রাত ফর্সা হয়ে আসে।

তাঁতী বৌ

এক তাঁতী আর তার বৌ। দিনরাত খটাখট্—। না, তাঁত বোনার খটাখট্ শব্দ নয়—ঝগড়ার খট্‌খটানি। ওটা তাদের মধ্যে লেগেই আছে!

শাকের ক্ষেতে গরু ঢুকেছে। তাঁতী বলে, আমি তাঁত বুনছি। তাঁতী-বৌ তুই গরু তাড়া।

তাঁতী-বৌ বলে, আমি রান্না করছি। গরজ থাকে তুমি তাড়াও।

তাঁতী বলে, আমি পারব না।

তাঁতী-বৌ বলে, আমি নড়ব না।

তাঁতী বলে, আমার জড়ানো কাপড় খুলে যাবে।

তাঁতী-বৌ বলে, আমার চড়ানো রান্না পুড়ে যাবে!

কেউ তারা গরু তাড়াতে যায় না। শাক ক্ষেত সাবাড় করে গরু চলে যায়!

খদ্দের এসেছে ভোরে কাপড় কিনতে।

তাঁতী বলে, তাঁতী-বৌ দোর খোল্।

তাঁতী-বৌ বলে, কেন কর গণ্ডগোল।

সে পাশ ফিরে শোয়।

জিদ ওদের কম নয়। কেউ আগে দোর খুলবে না! দোর খোলা হয় না। রোদ্দুর চারদিকে চমচম করে। খদ্দের ফিরে যায়।

দুপুর হয়ে যায়, তবু তারা দোর খোলে না। পাড়াপড়শীরা ভাবে কি হ'ল, ওদের বাড়ী এমন চুপচাপ কেন! লাঠি দিয়ে বাইরের থেকে দোর খোলে তারা। তখন তাঁতী আর তাঁতী-বৌ ঘর

থেকে বেরোয়।

ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল তাঁতী। তিনটে কৈ মাছ পেয়েছে সে। বাড়ী এসে তাঁতী-বৌকে দিল সেই মাছ রান্না করতে। তাঁতী-বৌ মাছ তিনটে কুটে রান্না করল।

খাওয়ার সময় তাঁতী বলে, আমাকে দুটো কৈ দে আর তুই নে একটা।

তাঁতী-বৌ চক্ষু কপালে তুলে বলে, কেন? এত আধিক্যেতা তোমার কি জন্যে শুনি?

আমি কত কষ্ট করে মাছ ক'টা ধরে এনেছি—

তাঁতী-বৌ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে,—আহা! শুনে মরে যাই! না। আমি কত কষ্ট করে মাছ কুটেছি, রান্না করেছি। আমি খাবো দুটো কৈ আর তুমি খাবে একটা। তাঁতী রেগে-মেগে বলে, না, কক্ষনও না। আমিই দুটো খাবো।

কথা কাটাকাটির পর হাতাহাতির উপক্রম! শেষটায় ঠিক হলো,—যে আগে কথা বলবে সেই খাবে একটা কৈ। গুম হয়ে থাকল দু'জনেই। কেউ কোন কথা বলে না! রান্নাভাত হাঁড়িতেই থাকল। কৈ মাছের ঝোল পড়ে থাকল কড়াইতে ঢাকা দেওয়া।

বাড়ীতে আর টুঁ শব্দ নেই,—কথা বললেই তাকে খেতে হবে একটা কৈ। কিন্তু একটা খেতে ওদের কেউই রাজী নয়।

তাঁতী-বৌয়ের আদরের পোষা বিড়ালটা ম্যাও ম্যাও করে কড়াইয়ের কাছে ঘুরে বেড়াল। তারপর ক্ষিদের জ্বালায় বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

তাঁতী চুপ করে শুয়ে রইল ঘরের মধ্যে। তাঁতী-বৌ এক পাশে মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকল। কারও মুখে কোন কথা নেই!

একদিন যায়, দু'দিন যায়। পাড়ার লোকে ভাবে, এটা কেমন হলো?—পাড়াটা একেবারে চুপ মেরে গেল যে! ওরা কি বাড়ী ছেড়ে চলে গেল নাকি দু'জনে?

তিন দিনের দিন পাড়ার লোকে গিয়ে দেখে, তাঁতী আর তাঁতী-বৌ মরার মত চোখ বুজে পড়ে আছে দু'জায়গায়! তারা কত ডাকাডাকি করল কিন্তু উত্তর দিল না কেউ। উত্তর দেবেই বা কি ক'রে? যে উত্তর দেবে তারই তো আগে কথা বলা হবে। আগে কথা বললে সে তো আর দুটো কৈ পাবে না, একটা কৈ খেতে হবে তাকে।

চার দিনের দিন পাড়াপড়শীরা ওদের মরা মনে করে মাদুর দিয়ে জড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে চলল। তখনও ওরা কেউ কথা বলে না। অবশেষে চিতা সাজিয়ে তার উপর ওদের যখন তুলে দেবে, তাঁতী-বৌ তখনও নির্বাক!

কিন্তু তাঁতী দেখল, খুব বেগতিক। পুড়ে যদি ছাই হয়ে গেলাম, তা হলে দুটো কৈ খাবে কে? দূর ছাই! সে তাড়াতাড়ি চিতার উপর থেকে বলে উঠল, ওরে তোরা আমায় পোড়াস্‌নে, আমি একটাই খাবো।

তাঁতী-বৌ তখন তাড়াতাড়ি উঠে বসে মাথার কাপড়টা টেনে দিল।

লেজের ঝাপ্‌টা খেল কেন তবে?

একজন লোক তীর্থ করতে যাবে। তার কিছু টাকা ছিল। টাকাটা রাখবে কোথায়? অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল, তার এক বন্ধুর কাছে টাকাটা গচ্ছিত রেখে যাবে।

বন্ধু বলল, তা রেখে যাও। তোমার টাকা আমার কাছে রাখাও যা, তোমার কাছে রাখাও তাই। ফিরে এসে দরকার মত চাইলেই পাবে।

অনেকদিন পরে তীর্থ থেকে ফিরে এসে লোকটি তার টাকা ফেরত চাইল বন্ধুর কাছে। বন্ধু তা শুনে যেন গাছ থেকে পড়ল। বলল, সে কি, আমি তো তোমার টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি!

বন্ধুর বেইমানিতে লোকটির বড় রাগ হলো। সে নালিশ করল গিয়ে রাজার কাছে।

রাজা পড়লেন মুস্কিলে। তিনি দেখলেন, ঐ লোকটি যে টাকা রেখেছিল বন্ধুর কাছে, তার কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই। যদি রেখেই থাকে, বন্ধুটি যে টাকা ফেরত দিয়েছে, তারও কোন সাক্ষী নেই।

রাজা ছিলেন মনসার ভক্ত। মনসার মন্দির ছিল একটা তাঁর বাড়ীতে। রাজা বিপদে আপদে পড়লে মনসা তাঁকে সাহায্য করত।

রাজা তার পাত্র-মিত্র সভাসদদের নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন, কিন্তু ঐ লোকটি আর তার বন্ধুর মধ্যে কে মিথ্যেবাদী তা কেউই বলতে পারল না।

রাজা সারারাত ভাবলেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান হ'ল না।

অবশেষে রাজা জানান দিলেন মনসাকে।

মনসা এক বিরাট বিষধর সাপকে পাঠিয়ে দিলেন। এই সাপের সম্মুখে শপথ করে যে মিথ্যা কথা বলবে, সাপ তাকে এক ছোবলে সেখানেই শেষ করে দেবে। যে মিথ্যা কথা বলবে না, সাপ তাকে ছোবল মারবে না।

সাপ এল। কুণ্ডলী পাকিয়ে রাজসভার মাঝখানটায় সে ফণা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল। লোকে লোকারণ্য। সাপের সেই লকলকে জিহ্বার দিকে তাকিয়ে সকলেরই প্রাণ উড়ে গেল।

কে মিথ্যেবাদী—ঐ লোকটি, না তার বন্ধু? সকলের মুখেই এক কথা।

লোকটি সাপের সম্মুখে শপথ করে বলল, সে তীর্থে যাওয়ার আগে বন্ধুর কাছে টাকা গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল কিন্তু বন্ধু সে টাকা তাকে ফেরত দেয়নি। সাপ মাথা দুলাতে লাগল। তাকে কিচ্ছু বলল না। সকলেই বুঝল, এ ব্যক্তি মিথ্যে কথা বলেনি। ও যে টাকা রেখে গিয়েছিল বন্ধুর কাছে, একথা সত্যি।

এবার বন্ধুর পালা। হাজার হাজার লোক। উদ্‌গ্রীব হয়ে বিচার দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এবার সাপের ছোবল থেকে ঐ বন্ধুটিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, তা সবাই বুঝে নিল।

বন্ধুটিরও ভয়ে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে তখন। অনেকে ভাবল, সে এবার এক দৌড়ে পালিয়ে যাবে সাপের কাছ থেকে।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? রাজরোষে পড়লে কারও রক্ষা নেই। রাজা তাকে ধরে হয় ফাঁসী দেবে, না হয় শূলে চড়াবে।

বন্ধুটি কিন্তু পালাল না। সে ঐ লোকটির কাছে বিদায় নিতে গিয়ে তার পিঠে হাত দিল। তারপর তার হাত ধরে সাপের কাছাকাছি এসে নিজের হাতের লাঠিটা ওকে ধরতে দিয়ে এগিয়ে গেল সাপের কাছে।

সমস্ত লোক তখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাবছে, সাপের ছোবল খেয়ে এবার মরবে এই শয়তান বন্ধুটি!

সে শপথ করে সাপের সম্মুখে বলল, আমি টাকা গচ্ছিত রেখেছিলাম সত্যি, কিন্তু সে টাকা ওকে আমি দিয়ে দিয়েছি। সে টাকা আমার কাছে নেই, ওর কাছেই আছে।

সাপটি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল রাগে, কিন্তু তাকে ছোবল মারল না। খুব জোর একটা লেজের ঝাপ্‌টা মেরে চলে গেল সভা ছেড়ে।

সমস্ত লোক অবাক হয়ে গেল। প্রকৃত মিথ্যেবাদীর হদিশ হলো না!

বন্ধুটি ফিরে এসে লোকটির হাত থেকে তার লাঠিটা নিয়ে বাড়ী যাবে, এমন সময় রাজা বললেন, ওহে, আমার সঙ্গে এক্ষুনি একবার দেখা করে যেও তো।

সে রাজার সঙ্গে দেখা করলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাপুহে, তুমি যদি সত্যিই নির্দোষ হবে, তাহলে লেজের ঝাপ্টা কেন খেলে বল দেখি!

লোকটি হাত জোড় করে বলল, মহারাজ, যদি অভয় দেন তা হলে বলতে পারি।

রাজা বললেন, বল।

বন্ধুটি কি বলল, বলতে পারিস তোরা? জিজ্ঞাসা করে চরকা বুড়ী। ছাই পারিস্। বল তো, লেজের ঝাপ্টা খেল কেন?

তবে শোন্।

লোকটি বলল, ধর্মাবতার, আমার হাতের লাঠির মধ্যে ওর সে টাকা ছিল। সাপের কাছে যাওয়ার আগে ওর হাতেই দিয়ে গিয়েছিলাম সে লাঠি। শপথ করে আমি মিথ্যে বলিনি। তবে ঐ চালাকীটার জন্যই খেতে হলো লেজের ঝাপটা।

ভূত চালানো সহজ নয়

ভূতের গল্প বল আজ—ছেলেরা ধরল চরকা বুড়ীকে। ভূত ? ভূত তো কবে সব পালিয়ে গেছে তোদের উৎপাতে।

না, সব ভূত পালায়নি, বলল একটি ছেলে। আমাদের গাঁয়ের একটি মেয়েকে ধরেছিল বাঁশ ঝাড়ের ভূতে। ওঝা এসে ভূত চালান দিয়ে তাকে ভালো করে দেয়। আচ্ছা, এত গাছ থাকতে বাঁশ গাছে ভূত থাকে কেন ? জিজ্ঞাসা করে আর একজন।

চরকা বুড়ী চরকা কাটে আর বলে—সবই বলছি, শোন্।

ভূত চালানো সহজ নয়। ওর বিপদ আছে অনেক। বড় বড় ওঝাদের এজন্য উচাটন, বিতাড়ন সব রকম বিদ্যে শিখতে হয়। ভূত-সিদ্ধ যারা, তারা উচাটন মন্ত্রে ভূতকে নামায়, আবার বিতাড়ন মন্ত্রে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

এই উচাটনের মন্ত্র-তন্ত্র শিখতে লাগে পুরো দশটি বছর আর বিতাড়নের মন্ত্র-তন্ত্র শিখতেও লাগে কমসে কম আরও দশ বছর। এই বছর কুড়ি ধৈর্য ধরে যারা গুরুর কাছে পড়ে থাকতে পারে—তারাই হয় ভূত মন্ত্রে সিদ্ধ।

কিন্তু তা তো হয় না। আমাদের ধৈর্য কৈ ? আমরা সব কিছুই ফাঁকি দিয়ে অল্পের মধ্যে সারতে চাই।

ওঝাদের বেলাতেও তাই। বছর কয়েক তাড়াতাড়ি করে উচাটন মন্ত্র শিখে, তারা আর বিতাড়ন মন্ত্র শিখতে চায় না। ভাবে, তারা সব শিখে ফেলেছে। তার ফল হয় সাংঘাতিক।

উচাটন মন্ত্রে ভূত আসে,—কিন্তু একটা শর্ত—সর্বক্ষণ তাকে কাজ দিতে হবে। কাজ না দিলে, অথবা বিতাড়ন মন্ত্রে তাকে

তাড়াতে না পারলে, সে তোমার ঘাড় মটকে চলে যাবে। কত ওঝার এই ভাবে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে।

একবার হয়েছিল কি, এক ওঝা পূর্ণ সিদ্ধ হওয়ার আগেই উচাটন মন্ত্রে ভূতকে আবাহন জানাল। তার আর দেরি সইছিল না।

ব্যস্, ভূত এসে উপস্থিত। উপায়? কাজ চাই তো! ভেবে-চিন্তে তো সে ভূতকে ডাকেনি।

ওঝা বলল, বাড়ী করে দাও, পুকুর কাটো। অমনি সঙ্গে সঙ্গে পুকুর, বাড়ী-ঘর সব হয়ে গেল। তারপর? ওঝার আর কোন কাজের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু কাজ দিতেই হবে ভূতকে, নইলে—

ওঝা তাড়াতাড়ি বলল,—জল আনো।

ভূত জল আনছে তো আনছেই। জলে থৈ থৈ। চারদিক জলে ডুবুডুবু। উপায়?

তখন বুদ্ধি করে ওঝা বলল, সব জল তুলে ফেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জল তুলে ফেলল ভূত। এবার? কাজ না দিতে পারলে এখনই তো তার ঘাড়টি মটকে মেরে ফেলে দেবে—কিন্তু এত কাজই বা কোথায়?

এমন উভয় সংকটের মধ্যে পড়েও লোকটির মাথায় ধাঁ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

ভূতকে সে কি করতে বলল, বল্ দেখি তোবা?—জিজ্ঞাসা করল চরকাবুড়ী।

ছেলেরা তখন এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

একজন বলল, ভূতকে ওঝা বলুক, দৌড়ে পালাও এখান থেকে এক্ষুনি—। আপদ বিদায় হোক্।

চরকাবুড়ী ঘাড় নেড়ে বলল,—উহুঁ, ওটি হবে না। একমাত্র বিতাড়ন মন্ত্রেই তাকে বলা যাবে—পালাও। বিতাড়ন মন্ত্র যে জানে না, তাকে কেবল কাজ দিয়ে যেতে হবে ভূতকে—বেকার থাকবে না সে এক মুহূর্তও।

চরকার সুতোটা ঠিক করে নিয়ে বুড়ী বলল,—চট্ করে ওঝার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল! সে ভূতকে বলল, ঝাড় থেকে খুব বড় দেখে একটা বাঁশ কেটে আনো।

বাঁশ এলো।

ওঝা বলল,—ঐ ফাঁকা জায়গায় বাঁশটা পোঁতো। পোঁতা হলো সঙ্গে সঙ্গে।

ওঝা হুকুম করে বলল, ঐ বাঁশের মাথায় ওঠো আর নামো।

আজ পর্যন্ত ভূত তাই করছে!

সেই একটা বাঁশ থেকে কত বাঁশ, কত ঝাড় ঝাড় বাঁশ হয়েছে।

ভূত আজও তাই বাঁশ ঝাড়েই ওঠা-নামা করে।

যে না জানে টিপের ঘা

গুরু চলেছেন শিষ্য বাড়ী।

সঙ্গে তাঁর তল্পিবাহক চেলা। কত পথঘাট পেরিয়ে এসে তাঁরা দু'জনেই খুব ক্লান্ত।

গুরু বসলেন একটা নদীর ধারে, জলের কাছে সবুজ ঘাসের উপর। খানিকটা জিরিয়ে নেবেন তিনি সেই ছায়া-শীতল নদী তীরে।

নদীটির নাম চিত্রা। শেওলা-ভরা এই চিত্রা নদী। কালো মিশমিশে তার জল। সবুজ ঘাস দিয়ে ঢাকা তার ঢালু তীর। উপরে তাল-তমাল, আম-জাম আরও কত কি গাছ।

একটি লোক মাছ ধরছে ছিপ ফেলে। গুরু সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন!

তল্পিবাহক চেলা জিজ্ঞাসা করল—কি হলো? গুরু অমনি মুখ ফিরিয়ে বললেন,—না, কিছু না। কিন্তু চেলার সন্দেহ যায় না। লোকটা ছিপ ধরে বঁড়শীতে টোপ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে হাসবার কি হলো?

সে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরল,—বলতেই হবে তিনি হঠাৎ হেসে উঠলেন কেন।

গুরু বলেন, এমনিই হাসি পেল, তাই হাসলাম। চেলার মন ওঠে না ও কথায়। বলল, এমনিতে কারও হাসি পায়? যাদের পায় তারা তো—গুরু চুপ করে থাকেন। চেলার রাগ হয়ে যায়।

সে বলে,—

হাসি কি আর এমনি আসে?
বিনা জলে পদ্ম ভাসে?

কারণ যদি না বল সোজা
রইল তোমার তল্পি বোঝা।

গুরু দেখলেন, এ তো বড় মুস্কিল। চেলা যদি চলে যায়, তাঁর তল্পি-তল্পা বইবে কে?

গুরু নরম হয়ে বললেন,—তবে শোন্। কাউকে বলিসনে কিন্তু। আমি মৎস্য-তন্ত্র জানি। মাছেরা জলের মধ্যে কে কি বলছে, আমি শুনতে পাই!

চেলা অবাক হয়ে যায় গুরুর কথা শুনে। গুরু বলেন,—এই যে লোকটি মাছ ধরছে, ওর বঁড়শীর কাছে এসেছে একটি কৈ মাছ। লোকটি কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু লোকটিকে সে বলছে,—

ছাইতে লটপট, বঁটিতে দুই কান কাটা,
ত্রিভুবন দেখাল মোরে চিলে বেটা;

গাছে মারলাম চিলের ছা,
জলে ডুবালাম বঁধুর না'
যে না জানে টিপের ঘা
তার কাছে গিয়ে টিপ টিপা।

গুরুর তল্পিবাহক চেলা বুঝতে পারে না মানে কিছু এর। সে জিজ্ঞাসা করে, তার মানে?

তার মানে তোরা কেউ বলতে পারিস্? জিজ্ঞাসা করে চরকা-বুড়ী। ছাই পারিস্!

তবে শোন্—

নদীর জলে খেলা করে কৈ মাছেরা মনের সুখে। ওদের দিদিমা সাবধান করে দিয়েছে—

খোকন সোনা, খুকীরা সব
একটু কিছু ক'রো না রব।
এইখানেতে কর খেলা—
এদিক ওদিক ভূতের মেলা।

ওদিকে বঁড়শীর মাথায় টোপ গেঁথে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায় একটি লোক। বাঁশের কঞ্চি তার ছিপ। তার মাথায় সুতো আর বঁড়শী বাঁধা।

কালো জলের মধ্যে টোপটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার!

একটা কৈ মাছ বলে,—দিদিমারা কেবল খবরদারি করে—এখানে খাস্‌নে,—এটা খাস্‌নে, ওটা ছুঁস্‌নে এই সব। সে ভাবল,—কেউ নিশ্চয় দেখতে পায়নি, ঐ সাদা পোকাটাকে। কেমন সুন্দর ঝুলছে ওটা! দিদিমা তো ধারে-কাছে নেই। এই ফাঁকে পোকাটাকে খেয়ে ফেলা যাক্।

তারপর?

তারপরই লোকটি মারল একটা হ্যাঁচকা টান, আর সঙ্গে সঙ্গে কৈ মাছটি বঁড়শীতে আটকে গিয়ে নাগরদোলায় পাক

খাওয়ার মত একটা পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল গিয়ে ডাঙ্গায় ঘাসের মধ্যে।

লোকটি বাঁ-হাত দিয়ে তার মাথাটা চেপে ধরে খুলে নিল বঁড়শীর কাঁটা। খালুইয়ের মধ্যে কৈ মাছটি লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করল—কিন্তু বেরুতে পারল না সে।

মাছ ধরার শেষে লোকটি বাড়ী ফিরল। পুঁটিমাছ, ট্যাংরা মাছ আর কৈ মাছ ধরেছে সে। পুঁটি-ট্যাংরার আয়ু শেষ। কৈ কিন্তু লাফাচ্ছে তখনও।

তার বৌ মাছ কুটতে বসল বঁটি নিয়ে। সম্মুখে খানিকটা ছাই। কৈ মাছটা যাতে ফসকে না যায় হাতের ভিতর থেকে, সেজন্য সে ঐ মাছটার এপিঠে ওপিঠে বেশ করে ছাই মাখিয়ে নিল। তারপর কাটল তার দু'খানা কান্‌কো।

সহসা কিসের একটা ছায়া পড়ল বঁটির কাছে, তারপরেই এক ছোঁ। ছোঁ মেরে একটা চিল কৈ মাছটাকে নিয়ে গেল বৌয়ের হাত থেকে।

কিন্তু ঐ চিলটার কাছ থেকেই ছোঁ মেরে ঐ মাছটাকে নেবার জন্য আরও দুটো চিল ওত পেতে ছিল আকাশে। তিন চিলে তখন প্রচণ্ড ছোটাছুটি। সমস্ত আকাশটা ঘুরে নাছোড়বান্দা চিল অবশেষে কৈটাকে এনে ফেলল—নদীর উপর হেলা নারকেল গাছটার মাথায়। এখানেই তার বাসা। বাসায় তার ছা আছে দুটো। ছা দুটিকে কৈ মাছটি উপহার দিয়েই চিল-মা পালাল সেখান থেকে—পাছে আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায় শিকারটাকে।

চিলের বাসায় কিছুক্ষণ হাঁপ ছেড়ে নিয়ে কৈ মাছটি বলল ঃ

চিলের ছানা
দিচ্ছে হানা
দেখছ কত বাজপাখি ?

বাজপাখির নাম শুনেই ছানা দু'টির মুখ একেবারে চুন।

তারা বলল :

তাই নাকি ?
—ডাক্ ত মাকে,
শুধাই তাকে
আমরা এখন করব কি ?

কৈ মাছটি তখন তিড়িং তিড়িং লাফাতে আরম্ভ করেছে। এদিকে চিলের ছানা দু'টি ভয়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে একে অপরকে।

এত হুটোপাটি সামান্য একটা বাসায় সইবে কেন ?—বাসা সুদ্ধ পড়ে গেল চিলের ছানা দু'টি নদীর জলে।

ঠিক সেই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা টাবুরে নৌকো ছোট্ট নতুন বৌকে নিয়ে। ছইয়ে ঢাকা টাবুরে নৌকো। মধ্যে বসে আছে রঙিন শাড়ী পরে নতুন-বৌ। খোঁপা করে তার চুল বাঁধা, কপালে টিপ, হাতে রঙিন চুড়ি, পায়ে আলতা। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাকে নিয়ে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বৌ তার ছোট ভাইটির জন্যে।

চিলের বাসাটা পড়বি তো পড়—একেবারে মাঝির মাথার উপর। মাঝি তো সঙ্গে সঙ্গে চিৎপটাং। আর আর যারা ছিল, তারা কেউ ধরতে গেল মাঝিকে, কেউ ধরতে গেল কৈ মাছটাকে। কেউ বা চিলের ছানা দু'টিকে সাপ ভেবে জলে দিল ঝাঁপ।

ওদের হুটোপাটিতে নৌকা গেল ডুবে। মুহূর্তের মধ্যে কি একটা ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে গেল। ওদের অবশ্য ডুবল না কেউ। নতুন বৌ ছইয়ের বাঁশ ধরে বেঁচে গেল। সে হাসতে হাসতে সকলকে নিয়ে আবার উঠল বাপের বাড়ী গিয়ে। তার ছোট ভাই জড়িয়ে ধরল এসে তার দিদিকে।

কান-কাটা কৈ ফিরে এল আবার নদীতে নৌকা ডুবিয়ে।

মাত্র দিন বারো অতীত হয়েছে। সেই লোকটি আবার এসেছে।

নতুন করে তার বঁড়শীর মাথায় টোপ গেঁথে টিপ টিপ করে লোভ দেখাচ্ছে—নদীর জলের কৈ মাছগুলোকে।

কিন্তু সে কৈ মাছটি তো আর কাঁচা ছেলে নেই এখন। সে তাই ঐ লোকটিকে বলছে ঃ

ছাইতে লটপট, বঁটিতে দুই কান কাটা,
ত্রিভুবন দেখাল মোরে চিলে বেটা ;
গাছে মারলাম চিলের ছা,
জলে ডুবালাম বঁধূর না',—
যে না জানে টিপের ঘা
তার কাছে গিয়ে টিপ টিপা।

তাই শুনে হাসছিলাম,—বললেন গুরু। মাছটি তার দিদিমার কথা অগ্রাহ্য করেছিল, এখন ঠেকে শিখেছে অনেক। বঁড়শীতে ও আর উঠছে না।

গদাধারীর সমুদ্র পার

আমার ভাসুরের গায়ে ছিল হাতীর মত জোর। চরকা বুড়ী গল্প করে। গাছের একটা মোটা ডাল এক টানে ভেঙ্গে দিতে পারত আমার ভাসুর।

একবার হলো কি শোন্।

পুজোর সময় ঠাকুর বিসর্জনের দিন আগে নৌকা-বাচের চলন ছিল খুব।

হাটে ঢেঁটরা পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো—নিশ্চিন্তিপুরে নৌকা-বাচের পাল্লা হবে।

অনেক নৌকা এসে জুটল। সেগুলি পঁচিশ-তিরিশ হাত লম্বা আর মাত্র হাত তিন-চার চওড়া। দু'জন করে বসল এক এক সারে বৈঠা নিয়ে। এইভাবে বসল কুড়ি-বাইশ জন প্রত্যেকটি নৌকায়। নৌকার সম্মুখের গলুইটা খুব লম্বা। সেটা মকর মাছের মুখের মত দেখতে, তাতে নানা রকমের পিতলের কারুকাজ করা। সকলের পিছনে হাল ধরে দাঁড়িয়ে হালী। তার মাথায় লাল গামছা। নৌকার মাঝখানে ঢাল-শড়কি নিয়ে লাঠিয়ালরা দেখাচ্ছে অনেক রকম কসরৎ। একজন বাজাচ্ছে কাঁসি। একজন তুলেছে নিশান।

এই বাচে যে জিতবে, তার পুরস্কার একটা পিতলের ঘড়া আর একটা চাদর। ঘড়াগুলি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে লম্বা বাঁশের মাথায় নদীর পাড়ে।

অনেকে বাচ খেলায় জিতে ঘড়া আর চাদর নিয়ে গেল। শেষ দল যখন বাচ দেবে, তখন আকাশে ঘনঘটা করে এল মেঘ। একে

ভাদরের ভরা নদী, তার উপর প্রচণ্ড মেঘ। হয়ত ঝড়ই উঠবে।

বহুদূর থেকে এসেচে ওরা। বাচ বন্ধ হয়ে যায় আর কি! উপায়?

এমন সময় ডাক পড়ল আমার ভাসুর গদাধারীর। দুই নৌকায় মোটা দড়ি বেঁধে আমার ভাসুর দু'হাতে শক্ত করে ধরে রইল। যে নৌকা তার হাতের দড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে সেই-ই জিতবে।

দু'দল প্রাণপণ শক্তিতে টানতে লাগল বৈঠা, কিন্তু ভাসুরের সেই মোক্ষম মুঠির থেকে দড়ি টেনে বেরিয়ে যেতে পারল না কেউ। তখন ঠিক হলো, কারও হার-জিত হয়নি, দু'দলই পুরস্কার পাবে।

কিন্তু ঘড়া তো আছে একটা! ছুটল তখন ওরা আর একটা ঘড়া আনতে। জমিদারবাবু হুকুম দিলেন, একটা নয়, দুটো ঘড়া নিয়ে এস। দু-দুটো বাচের নৌকা যে হাত দিয়ে টেনে রাখতে পারে তাকেও পুরস্কার দিতে হবে। গদাধারী পাবে সব চেয়ে বড় ঘড়া।

বিশ্বাস কচ্ছিস্ নে? ঐ দেখ্, সে ঘড়া আমার মাচার উপর আজও আছে,—চরকা বুড়ী দেখিয়ে দেয় আঙুল দিয়ে।

তোমার ভাসুরের নাম ছিল কি?

ভাসুর-শ্বশুরের নাম করতে নেই—উত্তর দেয় চরকা বুড়ী।

তবে যে বললে গদাধারী? জিজ্ঞাসা করে আর একজন।

ওটা তাঁর নাম নয়। যাত্রার দলে ভীমের পার্ট করত ভাসুর। ইয়া গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গদা হাতে লাফিয়ে পড়লে তোদের মত পুঁচকে ছোঁড়াদের প্রাণ উড়ে যেত জানিস্? তার থেকেই লোকে তাঁকে বলত গদাধারী ভীম।

একবার যাত্রা গানে দুঃশাসনের রক্ত পান করতে গিয়ে তাকে তো প্রায় মেরেই ফেলছিল ভাসুর!—ভাগ্যিস নকুল সহদেব আর অর্জুন তাকে জাপটে ধরে রাখে। সেকি গর্জন ভাসুরের!

তারপর?

তারপর একবার আমার ভাসুর গেলেন পুরী, রথযাত্রা দেখতে। পাড়াপড়শী সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

কেন ?

তখন হেঁটে যেতে হতো পুরী। পথে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। কাজেই শেষ বিদায় নিয়ে যেত সবাই আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে।

রথের দড়ি ধরে টানছে অনেকে। হঠাৎ এক জায়গায় রথের একটা চাকা কি ভাবে আটকে গেল। রথ আর চলে না। পাণ্ডা ঠাকুরদের মহা ভাবনা—এখন উপায় ?

তখন আমার ভাসুর রথের মোটা দড়িটা ধরে মারল এক টান। অমনি ঘর্ঘর করে রথ চলতে আরম্ভ করল।

খবর গেল রাজার কাছে। রাজা সব শুনে আমার ভাসুরকে মস্তবড় একটা পাথরের খোরা উপহার দিল।

ভাসুর তারপর সেই পাথরের খোরায় চড়ে সাগর পেরিয়ে চলে এল দেশে।

খোরায় চ'ড়ে কি সাগর পার হওয়া যায় ?

যায় না ? নাদায় চড়ে লোকে পদ্মফুল তোলে না ? বকাটে ছেলে সব ! তোরা আসিস্ কেন আমার কাছে গল্প শুনতে ? বিশ্বাস না করিস ওই দেখ, সে খোরাটা মাচার নীচে রয়েছে আজও !

ব্যাং-ইঁদুরের লড়াই

মস্ত বড় দীঘি। তার কালো জলে ফুটে আছে কত পদ্মফুল। রাজহাঁসেরা খেলা করছে সেই পদ্মবনে। সান বাঁধানো ঘাট। মেয়েরা কলসী করে জল নেয় এই দীঘি থেকে। তাদের পায়ের আলতার দাগ পড়ে সিঁড়িতে।

এই দীঘিতে বাস করে ব্যাংয়ের রাজা গালফুলা এক কোলা ব্যাং। তার সঙ্গে আছে ঘ্যাগোর ঘ্যাং, কুণো ব্যাং, জল ডুবুরী আরও কত সব পাত্রমিত্র পারিষদের দল। প্রচণ্ড গরমের পর বৃষ্টি নামলে তারা একসঙ্গে গান জুড়ে দেয়। কেউ ডুব-সাঁতার কাটে, কেউ পদ্মবনে লুকোচুরি খেলে।

দীঘির পাশেই গাঁয়ের মোড়লের বাড়ী। মোড়লের খামার বাড়ীতে মুগ, মটর, ছোলা। গোয়াল-ভরা গরু, গোলা-ভরা ধান।

এখানে বাস করে গেছো ইঁদুর, শোলো ইঁদুর, সরু দেঁতো, খাড়া কাণি—আরও কত সব ইঁদুরের দল। এটা যেন তাদেরই এক রাজ্য। তাদের কেউ ধান, কেউ ছোলা, কেউ পিঠে, আবার কেউ কলা খেতে ওস্তাদ! ওদের রাজা পিষ্টকাশী আর যুবরাজ শস্যহারী।

একদিন যুবরাজ শস্যহারী ভুরি ভোজনের পর প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে একটু হাওয়া খেতে এলেন দীঘির ধারে। তার গোঁফ জোড়া দীঘির ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দিয়ে জলপান কচ্ছেন আর দীঘির অপরূপ শোভা দেখছেন, এমন সময় গালফুলা কোলা ব্যাঙের সঙ্গে তার দেখা। গালফুলা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে তো চিনতে পারছি না! শস্যহারী তার গোঁফে চাড়া দিয়ে বলল,—চিনতে

আমায় পাববে কি কবে? আমি ইতর প্রাণীদেব সঙ্গে বড একটা মিশি না। আমি মানুষের বাড়ীতেই যাতায়াত করি। মানুষেরা যে সব ভালো ভালো খাবার করে, তাই খেয়েই আমি থাকি। তারা কত কি করে হাঁড়িতে লুকিয়ে রাখে, আমি কিন্তু সকলের আগেই তাতে ভাগ বসাই। মানুষ আমাকে ধরবার জন্য কত রকম ফাঁদ পাতে, কিন্তু আমি তাদের কলা দেখিয়ে সরে পড়ি। আমার বুদ্ধির সঙ্গে আর পারতে হয় না কারও!

গালফুলা বুঝল, ইঁদুরটি অত্যন্ত অহংকারী আর লোভীও খুব। ধরা না পড়ে এর আস্পর্ধা গেছে বেড়ে। একে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

তখন সে খুব আপ্যায়ন করে ইঁদুরকে বলল, আমার কিন্তু মনে

হয়, মানুষে যা সব খায় তা অত্যন্ত বাজে। এই দীঘির মাঝখানে আমার বাড়ী। দেবতারা যখন পদ্মবনে বেড়াতে আসেন, তখন আমার ওখানেই তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করেন।

সে শস্যহারীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, আমার সুখ-সরোবর রাজ্যে একবার পায়ের ধুলো দিয়ে দেখুন, সেখানে নাচ-গান আর খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন আছে।

তার কথা শুনে শস্যহারীর খুব লোভ হলো। সে ভাবল, মানুষের এত সব সুস্বাদু খাদ্য যে বাজে মনে করে, দেবতারা এসে যার খাদ্য খায়—না জানি সে-সব কতই সুমিষ্ট!

সে ব্যাংয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

তারপর সে তার সঙ্গীদের ডেকে বলল, দেখ, আমি এর সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি। আমার ফিরতে কিছু দেরি হবে। তোমরা ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর।

ব্যাং অমনি তার পিঠ পেতে দিল ইঁদুরকে উঠবার জন্য। ইঁদুরও এক লাফে গিয়ে উঠে বসল তার ঘাড়ে। সে দুই হাতে ব্যাংকে জড়িয়ে ধরে চলল সুখ-সরোবরে।

ব্যাংয়ের পিঠে চড়ে কিছুক্ষণ আরামে যাওয়ার পর ইঁদুর তাকিয়ে দেখে, চারদিকে অথৈ জল। ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল।

অনেকদূর গিয়ে ব্যাং মারল এক ডুব। কর কি! কর কি! বলে ইঁদুর নাকানি-চুবানি খেয়ে উঠতেই ব্যাং দিল আবার ডুব। আবার, আবার। হাবুডুবু খেয়ে যুবরাজ অনেক পরে তার ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু তখন সে নিরুপায়।

শস্যহারীকে ডুবিয়ে দিয়ে দীঘির এককোণে গিয়ে গালফুলা বসে থাকল পদ্মপাতার নীচে।

যুবরাজ শস্যহারীর মৃতদেহ ভেসে উঠল জলের উপর। একটা চিল তাকে মাছ মনে ক'রে ছোঁ মেরে ফেলল এনে ডাঙ্গায়।

রাজপুত্রের সঙ্গীরা তার সেই মৃতদেহ দেখে হায় হায় ক'রে উঠল।

তারা ছুটে গিয়ে এই দুঃসংবাদ জানাল রাজা পিষ্টকাশীকে। খবর শুনে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কপাল চাপড়িয়ে সে কাঁদতে লাগল, হায়! হায়! আমার তিন তিনটি বীর ছেলে সকলকেই যমে নিল।

পিষ্টকাশীর বড় ছেলেকে বিড়ালে মেরে ফেলেছে, মেজোছেলে মারা পড়েছে ইঁদুর-ধরা কলে। হায়! হায়!—

অবশেষে ছিল মাত্র কনিষ্ঠ নন্দন
আমার অন্ধের নড়ি একমাত্র ধন।
গালফুলা ব্যাং তারে ডুবাইল জলে
মরিল আমার যাদু সে বেটার ছলে!

না, আমরা এর প্রতিশোধ নেবো। পাত্রমিত্র সভাসদ সকলে একবাক্যে কিচির মিচির করে উঠল। আমরা এর প্রতিকার চাই!

পিষ্টকাশীও কান্না থামিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, সেই গালফুলা ব্যাংকে ধরে এনে শূলে চড়াবো আমরা।

অমনি চারদিকে লড়াইয়ের বাদ্য বেজে উঠল। নেংটি ইঁদুর, গেছো ইঁদুর, শোলো ইঁদুর সবাই এসে যোগ দিল লড়িয়েদের সঙ্গে!

পিষ্টকাশীর দূত দীঘির কাছে গিয়ে জোর গলায় জানাল—

শোন্‌রে ব্যাংয়ের রাজা শোন্ গালফুলা
ডেকে আন্ সাঙ্গপাঙ্গ আছে যতগুলা।
জলে ডুবাইয়া তুই মারি যুবরাজে
ভেবেছিস পার পাবি ত্রিভুবন মাঝে?

গালফুলা কিন্তু তার দোষ স্বীকার করল না। বলল, শস্যহারী মরেছে তার নিজের দোষে সাঁতার শিখতে গিয়ে। আমি তার কি করব?

কিন্তু ইঁদুরেরা তার এ কথা কানেই তুলল না। তারা লড়াইয়ে নেমে পড়ল।

লড়াইয়ের খবরে ব্যাংয়ের দলও সজাগ হয়ে উঠল। লড়াইয়ের বাজনা বাজিয়ে দিল ব্যাং সেনাপতি মেঘদূত। খবর শুনে কটকটে ব্যাং, সেগো ব্যাং, গেছো ব্যাং, সোনা ব্যাং, কুনো ব্যাং—এমন কি, ব্যাঙাচীগুলো পর্যন্ত এসে হাজির হ'ল।

ব্যাং সেনাপতি তার পোষাক পরে লাফ দিয়ে উঠল এসে ডাঙ্গায়। জলে আর ডাঙ্গায় তার সৈন্যের অবাধ গতি। শোলো ইঁদুর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পড়ল গিয়ে তার ঘাড়ের উপর। নেংটির দল কিচির মিচির করতে করতে এগিয়ে আসল জলের কিনারায়। বাজনাদার ইঁদুরেরা মাথায় লম্বা টুপী পরে দামামা বাজাতে আরম্ভ করল। জোর লড়াই বেঁধে গেল। পদ্মবন তোলপাড় হলো, দীঘির জলে ঢেউ উঠল, মাছেরা সব ভয় পেয়ে গেল।

ইঁদুর সৈন্যে দীঘির পাড় ছেয়ে গেল।

সাপেরা দীঘির পাড়ে এত ইঁদুর দেখে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল দলে দলে। চিল, কাক আর বাজপাখীর মহোৎসব লেগে গেল। ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে ছুটে এল বিড়ালের দল গাঁ উজাড় করে।

যে-সব ইঁদুর জলে ঝাপিয়ে পড়ল, তারা মরল ডুবে।

ইঁদুরের হলো চরম পরাজয়।

দীঘির জলে খেলে গেল রক্ত বানের ঢেউ,
ইঁদুর যত এসেছিল ফিরল নাকো কেউ!

ঢেঁকিরাম সাকরেদ

তবে শোন্—

চরকাবুড়ী চরকা ঘুরাতে ঘুরাতে বলে: তবে শোন্, তোদের এক হাতুড়ে সাকরেদের গপ্প বলি।

কোনো গাঁয়ে ছিল এক কবিরাজ। কবিরাজ হলে কি হবে, সে অনেক রকম চিকিৎসা করত। তেলপড়া, জলপড়া, তাবিজ-কবচ, গাছ-গাছড়া, হেকিমী, এমন কি ছুরি-কাঁচিও চালাত রোগীর গায়ে।

তার খুব পশার। দূর দূর গাঁ থেকে তার ডাক আসে। লোকে বলে, গাছের শেকড় তার সঙ্গে কথা বলে। কাউকে ভূতে ধরলে, ঐ কবিরাজ একটা গাছের শেকড় রোগীর নাকের কাছে ধরলেই ভূত বাপ বাপ বলে পালাবে।

এক দুই ক'রে শিষ্য-সাকরেদও জুটে গেল তার অনেক। রোগীর বাড়ী গিয়ে কবিরাজ নির্দেশ দেয়, আর সাকরেদ সেই অনুসারে দেয় ওষুধ। ঢেঁকিরাম ছিল তার একজন বড় সাকরেদ।

জমিদার বাড়ীর হাতী। রোজ তাকে স্নান করিয়ে চন্দনের ফোঁটা পরানো হয়। তার গলায় ঘণ্টা, পায়ে নূপুর। যখনকার যে ফল, তা খাওয়ানো হয় এই হাতীকে। তা ছাড়া রোজ এক গামলা রসগোল্লা বরাদ্দ তো ছিলই।

জমিদার যখন বেড়াতে যেতেন, তখন হাতীর পিঠে গালিচার উপর হাওদা চাপিয়ে তার উপর মখমলের গদি পেতে দেওয়া হতো।

এ হেন হাতীর একদিন হঠাৎ গলা ফুলে উঠল। গলা দিয়ে আর কিছু নামে না। সর্বনাশ! উপায়?

ডাক পড়ল বড় বড় হেকিম, বোদ্দি, কবিরাজের, কিন্তু কেউই

হাতীর গলাফুলা ভালো করতে পারল না।

তিন দিন হাতী কিছু না খেয়ে পড়ে রইল—খাবেই বা কি করে? গলা দিয়ে নামলে তো খাবে? গলা তো ফুলে ঢাক হয়ে রয়েছে!

কোন্ বোদ্যি পারে এর চিকিৎসা করতে? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। খবর এল নিশ্চিন্তিপুরের কবিরাজের মত ধন্বন্তরী কবিরাজ কেউ নেই এ তল্লাটে।

তখনই পাল্কী পাঠালো জমিদার—এখনই সে ধন্বন্তরীকে নিয়ে আসতে হবে।

কবিরাজ স্নান করে ফোঁটা কেটে, চুল আঁচড়ে নিল। সঙ্গে গেল তার করিৎকর্মা সাকরেদ ঢেঁকিরাম। কত রকম গাছপালা, ওষুধের বড়ি, সাঁড়াশী, হাতুড়ী, নরুণ—এইসব চলল লোকের মাথায় ঝুড়ি বোঝাই ক'রে। ঢেঁকিরাম সাকরেদ চলল সেই সঙ্গে।

কবিরাজ পাল্কীতে উঠে বসল। হেইয়া হো, হেইয়া হো করে পাল্কী ছুটল জমিদার বাড়ীর দিকে।

পাল্কী থেকে নেমেই কবিরাজ মশায় গেল হাতীশালায়। হাতীটাকে দেখল বেশ করে। মাহুত বলল, ভালো হাতী—তরমুজ খাচ্ছিল, তারপরেই এই অবস্থা!

কবিরাজ বলল, হুঁ।

একনাদা ইসুবগুলের ভূষি ভিজাতে বলে কবিরাজ লোকজন সব সরিয়ে দিল সেখান থেকে। তারপর ঢেঁকিরামকে সঙ্গে নিয়ে গেল হাতীশালায়। তার হাতে একটা হাতুড়ী। ঢেঁকিরামকে বলল, খুব জোরে মার দুটো হাতুড়ীর ঘা ঐ ফুলো জায়গায়। সে সঙ্গে সঙ্গে মারল চারটে ঘা! তায়পর হাতীর মুখে ঢেলে দেওয়া হলো সেই এক নাদা থলথলে ইসুবগুলের ভূষি, আর অমনি সড়াৎ করে নেমে গেল হাতুড়ী দিয়ে সেই ভাঙ্গা—

কি বল্ তো? জিজ্ঞাসা করে চরকা বুড়ী।

ছেলেরা বলতে পারে না। চরকা বুড়ী তাদের ভেংচি কেটে বলে, কোনও বুদ্ধি নেই! তোরাও এক একটা ঢেঁকিরাম। কেবল মুখেই ফটফটানি। সড়াৎ করে নেমে গেল চারখণ্ড ভাঙ্গা তরমুজ। হাতী একটা আস্ত তরমুজ গিলে ফেলেছিল, সেটা আটকে গিয়েছিল তার গলায়! হাতুড়ীর ঘা খেয়ে সেই তরমুজ গেল ভেঙ্গে আর তা সহজেই চলে গেল হাতীর পেটের মধ্যে।

হাতী শুয়ে ছিল, উঠে দাঁড়াল। ফুলোটাও কমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এক গামলা রসগোল্লা সে টপ টপ করে খেয়ে ফেলল।

অমনি ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল চারদিকে। এতবড় কবিরাজ আর ত্রিভুবনে নেই।

সাতদিন পরে হাতীর পিঠে চ'ড়ে নিশ্চিন্তিপুর ফিরে এল গুরু আর তার সাকরেদ। মুখে মুখে রটে গেল, এতবড় কবিরাজ কোনদিন হয়নি, হবে না।

ঢেঁকিরামের দিদিমার ছিল গলগণ্ড। কত রকম ওষুধপত্র দিয়ে কিছুই হয়নি। লোকে বুড়ীকে পরামর্শ দিল, তোমার নাতি এতবড় কবিরাজের শিষ্য, এত তার নাম ডাক, তাকে একবার দেখাও।

ডাক পড়ল ঢেঁকিরোমের। ঢেঁকিরাম বলল, এতটুকু গলগণ্ড। হুস্‌। হাতীর গলার গলগণ্ড সারিয়ে দিলাম, তার কাছে এতো কিছুই না।

একবাটি ইসুবগুলের ভূষি ভিজিয়ে নিল ঢেঁকিরাম। অনেক রাত্রে নিরিবিলিতে হাতুড়ী দিয়ে মারল দিদিমার গলায় জোর দু'ঘা। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে দিদিমা অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর সব চুপ।

ভিজানো ইসুবগুলের ভূষি আর গলা দিয়ে নামল না দিদিমার। সব শেষ হয়ে গেছে তখন তার।

ভোর বেলায় ঢেঁকিরামকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না সে গাঁয়ে।

কে বড় চালাক ?

তোরা সব তুলোর বীচি ছাড়া। আমি তোদের গল্প শুনাই। বলে চরকাবুড়ী।

এক গাঁয়ে থাকত তিন ঠক। তারা সবাই নিজের নিজের বুদ্ধির কথায় পঞ্চমুখ! সবাই ভাবে, তার মত চালাক আর কেউ নেই। এই নিয়ে তাদের বেঁধে গেল একদিন ঝগড়া। ঝগড়া থেকে হাতাহাতি হবার উপক্রম!

গাঁয়ের শেষে বাস করত একটি লোক। সে বলত, তার নাম বোকারাম। অনেকে কিন্তু বিপদে-আপদে তার কাছ থেকেই বুদ্ধি নিত।

তিন ঠক গেল বোকারামের কাছে। জিজ্ঞাসা করল, আমাদের মধ্যে কে বড় চালাক, তা' তোমাকে বলতে হবে।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কাজ না দেখে কি তা বলা যায়? তোমরা আজকের দিনে যে যা চালাকী ক'রে বাগাতে পারবে, তা আমাকে এনে দেবে। তার থেকেই বুঝা যাবে, কে চালাক।

ঠকেরা তাতে রাজী হয়ে বেরিয়ে পড়ল এক সঙ্গে।

কত দূর গিয়ে এক মাঠের মধ্যে তারা দেখে, গাধার পিঠে চড়ে একটি লোক যাচ্ছে। তার সঙ্গে আছে একটি রামছাগল। তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ছাগলের দড়ি গাধার লেজের সঙ্গে গিঁট দেওয়া। ছাগলটি গাধার পিছন পিছন হাঁটছে আর ঠুন্ঠুন্ করে বাজছে তার গলার ঘণ্টা।

ঐ ভাবে লোকটাকে যেতে দেখে ঠকেরা তো হেসেই খুন!

চট করে তাদের খেয়াল হ'ল,—এর উপরই আমাদের চালাকী খাটাতে হবে। দেখা যাবে, কে বড় চালাক।

প্রথম ঠক বলল, আমি ওর ছাগলটাকে চুরি করব! দ্বিতীয় ঠক বলল, আমি ওর গাধাটাকে নিয়ে হাওয়া দেবো। তৃতীয় ঠক বলল,—আমি ঐ লোকটার গায়ের জামা—এমন কি পরনের কাপড়খানি পর্যন্ত লোপাট করে নেবো!

প্রথম ঠকটি গাধার পিছন পিছন গিয়ে ছাগলের ঘণ্টাটি খুলে বেঁধে দিল গাধার লেজের সঙ্গে। তারপর দড়িটি খুলে রাম-ছাগলটাকে নিয়ে সরে পড়ল। দ্বিতীয় ঠক গাধার পিছন পিছন চলতে লাগল খুব ভালো মানুষটির মত। অনেকদূর যাওয়ার পর ঐ লোকটির কেমন খেয়াল হ'ল—ঘণ্টা ঠিক মত যেন বাজছে না! সে অমনি গাধা থেকে নেমে পিছনে গিয়ে দেখে ছাগল নেই।

সে ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল।

নমস্তে শেঠজী, কিছু হারিয়েছে নাকি?—জিজ্ঞাসা করে দ্বিতীয় ঠক।

তাজ্জব কি বাৎ!—আমার রামছাগলটা পিছন থেকে চুরি করে নিয়ে গেল কে!

রামছাগল? ও।—এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম, ঐ পথে একটা লোক রামছাগল নিয়ে যাচ্ছে। তুমি ছুটে গেলে ধরতে পারবে তাকে এখনও।

তুমি এই গাধাটাকে একটু দেখবে? আমি খুঁজে আসি চোরটাকে ধরতে পারি কিনা—

নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি একটুও দেরি করো না। সোজা গিয়ে ডান দিকে তারপর তেমাথা পথের বাঁ-দিকে উত্তর দিকের পথ ধরতে হবে। সেখান থেকে খানিকটা গিয়েই পূর্বদিকের পথে নামলেই সে লোকটাকে পাবে।

ওর থেকে হদিশ করতে পারল না শেঠজী পথের নিশানা। তবু সে ছুটল।

দ্বিতীয় ঠকও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গাধা নিয়ে পগারপার। সে সোজা গিয়ে উঠল বোকারামের বাড়ী। প্রথম ঠক আগেই সেখানে রামছাগলটা হাজির করে বসে আছে।

এদিকে শেঠজী সারাদেশ খুঁজেও ছাগল-চোরের খোঁজ পেল না। তখন সে ফিরে এল তার গাধার কাছে। কিন্তু কোথায় গাধা? গাধা তখন বেপাত্তা।

কাকেই বা সে জিজ্ঞাসা করবে? কেউই নেই সে অঞ্চলে তখন।

মনের দুঃখে শেঠজী বনের পথ ধরে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। পথে দেখে, একটা লোক বুক চাপড়াচ্ছে আর হায় হায় করে কাঁদছে।

কি হ'য়েছে তোমার? জিজ্ঞাসা করে শেঠজী।

সব্বনাশ হয়ে গেছে আমার শেঠজী,—আমার টাকার থোলেটা—

তাই নাকি? আমারও যে সর্বনাশ হয়ে গেল এই মাত্র। রামছাগল আর গাধা তুটোই চুরি হ'য়ে গেল আমার।

কেন, গাধায় তুমি চড়ে যাচ্ছিলে না?

তা তো যাচ্ছিলাম—

তবে?

বুদ্ধির ভুল ভাই। একটু ভুলের জন্যে ঠকিয়ে নিয়ে গেল গাধাটাকে।

তোমার তো নিয়ে চলে গিয়েছে। আমার টাকার থলে তো নিয়ে যেতে পারেনি। তাকে ধরে ফেলেছিলাম আমি। এই কুয়োর মধ্যে সে ফেলে গেছে থলিটাকে।

শেঠজী কুয়োর মধ্যে উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করে, জল আছে নাকি বেশি?

মনে তো হয় না। তুমি নামতে পার ভাই? তা হলে থলিতে যা আছে তার অর্ধেক তোমায় দেবো।

শেঠজী মনে মনে ভাবে, থলিতে যদি চার টাকা থাকে, তা হলে তার অর্ধেক তু'টাকার জন্যে অবেলায় এই কুয়োর মধ্যে নামা চলে না। না বাবা, অনেক ঠকেছি, আর ঠকছি না।

সে সোজা জিজ্ঞাসা করে, থলিতে কত টাকা আছে?

চারশো টাকা। তা ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেবো বলে গয়নাও গড়িয়ে রেখেছি কিছু। তাও আছে ঐ থলিতে। না, সেটাতে কিন্তু তুমি ভাগ বসাতে চেও না।

না, তা বসাবো না। কিন্তু টাকার ভাগ দেবে তো ঠিক? মানুষকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—অনেক ঠকেছি কি না।

আমি ভগবানের নামে দিব্বি করে বলছি,—তুমি যদি কুয়ো

থেকে টাকার থলি তুলতে পার—আমি নিশ্চয় তোমাকে অর্ধেক ভাগ দেবো।

শেঠজী দেখল, সবই তো হারিয়েছি। যদি দু'শো টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি!—তাছাড়া সে থলি তো থাকবে আমারই হাতে। ভাগ না দিয়ে যাবে কোথায়?

সে তার গায়ের জামা, মাথার পাগড়ী, এমন কি পরণের কাপড়খানি পর্যন্ত খুলে গামছা পরে নেমে গেল কুয়োর মধ্যে।

টাকার থলে-টলে কিন্তু বাজে কথা। ঐ লোকটিই হচ্ছে তৃতীয় ঠক। শেঠজী কুয়োর মধ্যে নামামাত্র সে তার জামা-কাপড় নিয়ে দে চম্পট।

শেঠজী তখন কুয়োর মধ্যে কাদা হাতড়াচ্ছে আর টাকার থলি খুঁজছে!

তিন ঠক এসে জড়ো হ'ল বোকারামের বাড়ীতে। ছাগল, গাধা আর জামা-কাপড় সব তাকে দিয়ে দিল তারা। সকলেই নিজের নিজের গুণকীর্তন করে তারপর জিজ্ঞাসা করল, এখন বলো, আমাদের মধ্যে বেশি চালাক কে?

বোকারাম কাকে বেশি চালাক বলল, বল্ তো তোরা?—জিজ্ঞাসা করে চরকা বুড়ী।

ছেলেদের একজন বলে,—তৃতীয় ঠক। লোকের পরণের কাপড় ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সহজ কথা নাকি?

উহুঁ। বলতে পারলিনে কেউ। উত্তর দেয় চরকা বুড়ী। বোকারাম কি বলল শোন। সে বলল,—তোমরা কেউই একা একা বড় চালাক নয়। ছাগলটাকে পিছন থেকে সরিয়ে ফেলা আর এমন কি কঠিন কাজ? তারপর আর দুজন তো প্রত্যেকেই অপরের সাহায্য নিয়ে কাজ হাসিল করেছ।

ছাগল খুঁজতে না গেলে গাধা সরানো যেত না, আবার গাধা

না হারালেও হাঁটা পথে শেঠজী কুয়োর ধারে যেত না। আর যথা-সর্বস্ব না খোয়ালেও গামছা পরে সে কুয়োয় নামত না।

চরকা বুড়ী হাতের কাজ শেষ করে জিজ্ঞাসা করে—তোরাই বল না, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চালাক কে? একটি ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বলব? বোকারামই সব চেয়ে বেশি চালাক। সে ঘরে বসে চালাকী করে ছাগল, গাধা, জামা-কাপড় পেয়ে গেল।

বীচি ছাড়ানোর পর সব তুলোই তখন পিঁজা হয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের।

আর একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—তবে বলব? সক্কলের মধ্যে বেশি কে চালাক?

বল্ না,—হাসতে হাসতে বলে চরকা বুড়।

সে আঙুল দিয়ে বুড়ীকে দেখিয়ে বলে, চরকা বুড়ী নিজে!

বাঁদরের চালাকি

বাঁদরের পিঠে ভাগ করার গল্প তোরা সবাই জানিস্,—বলল চরকাবুড়ী। আজ বাঁদরের একটা চালাকির গল্প বলছি শোন্ঃ

এক বাঘের লেজটা কি ভাবে আটকে যায় দুটো বড় বড় পাথরের মাঝখানে। বাঘ কত চেষ্টা করল কিন্তু লেজটাকে বের করতে পারল না।

মহা মুস্কিল। খুব জোরে টানাটানি করলে লেজটা ছিঁড়ে যাবে নাকি শেষটায়। লেজ ছিঁড়ে গেলে বাঘ মুখ দেখাবে কেমন করে? সবাই তখন বলবে, কে যেন বাঘকে ধরেছিল। তারপর বাঘ কাকুতি-মিনতি করায় ওর নাক-কান না কেটে লেজটি কেটে ছেড়ে দিয়েছে। সে বড় অপমান।

এক রাখাল ছেলে যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। বাঘ তাকে ডেকে বলল,—ভাই রাখাল, আমার লেজটি ছাড়িয়ে দাও না। আমি কোনদিন আর তোমার পালের ছাগল ভেড়া মারব না। অন্য জায়গা থেকে গরু বাছুর তাড়িয়ে এনে তোমার পালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো।

রাখাল ভয় পায়।

বাঘ বলে, কোন ভয় নেই তোমার। আমি কি এতই নরাধম যে, উপকারীর উপকারের কথা মনে রাখব না? আমি বেঁচে থাকতে আর কোন বাঘ তোমায় খেতে পারবে না। আর কেউ এলে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবো। তুমি আমায় বাঁচাও ভাই।

বাঘের কাতর আবেদন শুনে রাখালের খুব দয়া হলো। সে একখানা পাথরকে খুব জোরে ঠেলে সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে

বাঘের লেজটিও বেরিয়ে এল।

লেজ ফিরে পেয়ে বাঘের তেজ গেল বেড়ে। বলল,—হালুম্, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে—আগে তোকেই খাবো। রাখাল ভয় পেয়ে বলল,—সে রকম তো কথা ছিল না। বাঘ বলে,—আর কোন বাঘ তোকে খেতে পারবে না, আমি এই কথাই বলেছি। তার সোজা মানে আমিই তোকে খাবো।

রাখাল বলল,—আচ্ছা, দু'একজনকে আমি সমস্ত ব্যাপারটা বলি। তারা যদি বলে আমাকে তোমার খাওয়াই উচিত, তুমি খেও।

পাহাড়ের গা বেয়ে যাচ্ছিল এক সাপ। রাখাল বলল,—সাপ ভাই, শোনো তো।

সাপ বলে,—কি? লাঠি দিয়ে ঠ্যাঙ্গাবে নাকি আমাকে?

না, না। তুমি একটা বিচার করে দাও। এই বাঘ মশায়ের লেজটা আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি। ওটা আট্‌কে গিয়েছিল দুই পাথরের মাঝখানে। এখন উনি আমাকে খেতে চান,—এটা কি ওর উচিত?

সাপ বলেঃ একশোবার উচিত। মানুষ জাতটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমাদের দেখলেই কারণে অকারণে মানুষ আমাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

বাঘ বলে,—শুনলে তো!—এবার এস, তোমাকে খাই। শুনে রাখালের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, আর একজনকে জিজ্ঞাসা করতে দাও।

উপরে গাছের ডালে বসে ছিল এক বাঁদর! বাঘের সঙ্গে তার অনেক দিনের জানাশোনা। বাঘ বলল,—এবার ঐ বাঁদরকেই জিজ্ঞাসা কর কি বলে। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে—আর কাউকে কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে দেবো না।

রাখাল কাতর কণ্ঠে বলল—'বানর ভাই, একটা বিচার করে দাও।' বাঁদর কিন্তু সব কথা আগেই শুনেছে। সে দেখল, খাওয়া উচিত নয় বললে বাঘ তা শুনবে না। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। বাঘ রাখালকে খাবেই। কিন্তু কি ক'রে ওকে বাঁচানো যায়! চট্ করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। বাঁদর গাছের ডাল থেকে বলল—কিছু বলছ নাকি আমাকে? কানে বড্ড কম শুনছি আমি আজকাল। আমার কাছে এসে যদি

বল, সব শুনতে পারি।

রাখাল গাছে উঠে গিয়ে বাঁদরকে সব ব্যাপারটা বলল। বাঁদর খুব আস্তে আস্তে তাকে বুদ্ধি দিল,—এইবার তরতর করে মগডালে উঠে বসে থাক গিয়ে।

তারপর বাঁদর জোরে জোরে বলল,—নিশ্চয় তোমাকে খাওয়াই উচিত বাঘের। কেন খাবে না শুনি? মানুষ বাঘকে দেখলেই তো গুলি করে!

কিন্তু রাখাল ততক্ষণে গাছের মাথায়।

বাঘ কিছুক্ষণ গাছের গোড়ায় বসে হালুম-হুলুম করল, লেজ নাড়ল, জিভের জল চাটল। গাছের গুড়িটা হেঁচড়ে দিল নখ দিয়ে। তারপর রাগে গরর্ গরর্ করতে করতে চলে গেল।

কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়

চরকাবুড়ী চরকা ঘুরায় আর বলে ঃ

এক গরীব চাষী। তার দুই ছেলে। বড় ছেলেটি খুব চালাক-চতুর আর ছোট ছেলেটি নিপট ভালো মানুষ। সাত-পাঁচের মধ্যে সে নেই।

সকলে তাকে হাবারাম বলে ডাকে।

চাষী হঠাৎ একদিন মারা গেল। বড় ভাই আলাদা করে দিল ছোট ভাইকে।

হাবারাম তার দাদাকে বলে,—সব জিনিষ কি করে ভাগ হবে? বড় ভাই বলে,—কেন? সব জিনিষেরই তো তুই পাবি অর্ধেক আর আমি পাবো অর্ধেক। এ তো সহজ হিসাব।

কিন্তু একটা জিনিষকে দু'ভাগ করা যায় কি করে?

কেন?—তুই অর্ধেকটা নিবি আর আমি অর্ধেকটা নেবো। এই ধর, যেমন গাই গরুটা। তুই নে ওর মাথার দিকটা আর আমাকে দে পেছন দিকটা। কেমন রাজী?

হাবারাম তাতেই রাজী। সে ঘাস কেটে গরুকে খাওয়ায়, গরুর শিংয়ে যত্ন করে তেল মাখায়।

আর বড় ভাই দু'বেলা দুধ দুইয়ে নেয়, গোবর নিয়ে ঘুঁটে দেয়।

হাবারাম এক ছটাক দুধও খেতে পায় না, একখানা ঘুঁটেও পায় না। তার বড় দুঃখ। কিন্তু সে কোন উপায়ও খুঁজে পায় না। সে নিজেই তো গরুর মাথার দিকটা নিতে রাজী হয়েছে।

একদিন এল ওদের মামা। মনের দুঃখে সব কথা তাকে বলল হাবারাম। মামা তাকে বুদ্ধি দিলঃ তুই গরুকে খাওয়ানো বন্ধ করে দে।

তাই করল সে।

গরু খেতে পায় না। দুধও হয় না।

বড় ভাই বলে, গরুকে খেতে দিস্ না কেন?

হাবারাম বলে, খেতে দিয়ে কি হবে? দুধ পাবো এক ছটাক? না ঘুঁটে পাবো একখানা?

বড় ভাই দেখল, খুব প্যাঁচে পড়ে গেছে সে। বলল, আচ্ছা তুই গরুকে ভালো করে খেতে দে,—দুধ, ঘুঁটে দুইয়েরই ভাগ পাবি।

আমগাছে মুকুল আসবার সময় এসেছে। বড় ভাই হাবাকে ডেকে বলে,—এবার তুই নিজেই বল্ গাছের কোন্ দিকটা নিবি তুই।

মাথার দিকটা নিয়ে হাবারাম গরুর বেলায় বিপদে পড়েছিল। সে কথা তার মনে আছে। তাই এবার সে জোর দিয়েই বলল,—না, মাথার দিকটা আমি নেব না। গোড়ার দিকটাই আমি নেবো।

বেশ, তাই হবে। বলল বড় ভাই।

হাবারাম গাছের গোড়া পরিষ্কার করে। গোড়া খুঁড়ে দেয়, সারের মাটি দেয়।

প্রচুর আম হলো গাছে। বড় ভাই পাকা পাকা আম পেড়ে নিয়ে যায়, ছোট ভাইকে একটাও দেয় না।

একদিন বড় ভাই গাছের ডাল ভেঙ্গে আম পাড়ছে,—হাবারাম বলে, ডাল ভাঙ্গছ কেন?

বড় ভাই বলে, গাছের মাথার দিকটা আমার। আমি সেখানে যা খুশী তাই করি—তাতে তোর কি?

হাবারাম মনের দুঃখে গেল মামার কাছে। বুদ্ধি নিয়ে এল।

একদিন হাবারাম কুড়ুল নিয়ে গাছের গোড়ায় দিল কোপ। বড় ভাই 'আরে হাবা, কি করিস্ কি করিস্' বলে ছুটে এল। হাবা

বলে, গাছের গোড়ার দিকটা তো আমার। আমি সেখানে যা খুশী তাই করি, তাতে তোমার কি? গোড়া রেখে কি হবে? একটা আম খেতে পাই আমি?

বড় ভাই বেগতিক দেখে বলল,—আচ্ছা আচ্ছা। আমের ভাগও তুই পাবি এখন থেকে।

ওদের বাবার ছিল একটা তালপাতার টোকা। সেটা মাথায় দিয়ে সে চাষের কাজ করত।

বড় ভাই টোকাটা নিয়ে হাবারামকে বলে,—এটা কি ভাবে দু'জনে ভাগ করে নেবো বল্?

হাবারামের মাথায় বুদ্ধি আসে না। বড় ভাই বলে, শোন্, হয় তুই রাত্রে, আমি দিনের বেলায় নিই। অথবা আমি দিনের বেলায় নিই, তুই রাত্রে নে।

হাবারাম কথার মারপ্যাঁচ বুঝল না। সে তাতেই রাজী হয়ে গেল।

বড় ভাই সারাদিন টোকা মাথায় দিয়ে কাজকর্ম করে। সন্ধ্যে বেলায় টোকাটা হাবারামকে ফিরিয়ে দেয়। হাবা রাত্তির বেলায় টোকা দিয়ে কি করবে? রাত্রে তো আর রোদ্দুর থাকে না! টোকা তার ঘরেই পড়ে থাকে। সকাল হলেই আবার বড় ভাই সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হাবারাম রোদ-বৃষ্টিতে তার ক্ষেতের কাজ করে। সে কেবল ভাবে, কেন আমি বোকার মত টোকাটা রাতের বেলায় নেবো বললাম!

চাষীর ছিল একখানা মোটা কাঁথা। দু'ভাই তারও সমান ভাগ পাবে। চোত মাস থেকে ভাদ্র মাস অবধি কাঁথাখানি মাচার উপর ভাঁজ করা থাকে।

আশ্বিন মাস পড়তেই বড়ভাই হাবারামকে ডেকে বলে, কাঁথাখানা কি ভাবে ভাগ হবে, তুই-ই বল। হাবার টোকার কথা মনে আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, রাতের বেলায় আমি কিন্তু নেবো না।

বেশ তাই-ই হবে। তুই সন্ধ্যেবেলায় কাঁথাখানা আমায় দিয়ে দিবি, আমি সকাল হলেই তোকে ফেরত দেবো। তুই ওটা রোদ-টোদ দিয়ে রাখবি।

হাবা মাঘ মাসের শীতে ঠক ঠক করে কাঁপে রাতের বেলায়। বড় ভাই মোটা কাঁথা গায় দিয়ে নাক ডেকে ঘুমায়।

হাবার বড় কষ্ট। সে ছুটল মামার কাছে। বুদ্ধি নিয়ে এলো। হাবারাম বাড়ী এসেই বিকেল বেলায় কাঁথাটা জলে ভিজিয়ে রাখল। সন্ধ্যে বেলায় বড় ভাই চটিতং। কাঁথাটা ভিজিয়েছিস্ কেন? হাবা বলে,—দিনের বেলায় কাঁথা আমার। তখন আমি যা খুশী করি, তোমার কি?

বড় ভাই দেখল, এর সাথে তো আর পারা যাবে না। তখন সে ঠেলার চোটে আপনা থেকেই ছোট ভাইকে ঠকানোর চেষ্টা ছেড়ে দিল।

ভাগ-বাঁটোয়ারা সহজ নয়

হাবারামের বোকামীর কথা শুনে ছেলে-মেয়েরা হেসেই খুন। বলে, ভাগ করতে জানে না, কোন্ ভাগটা নিতে হবে তাও বোঝে না হাবা! কী বোকা!

চরকাবুড়ী বলে,—ভাগ বাঁটোয়ারা সহজ নয় রে। তোরা তো লেখাপড়া করিস, ভাগ করতে জানিস?

একটা ছেলে বলল, সূক্ষ্ম ভাগ পারব না, তবে মোটা ভাগ পারব।

চরকাবুড়ী বলল,—ভেড়া তো আর সূক্ষ্ম জীব নয়। ভেড়াই ভাগ কর দেখি।

এক চাষীর ছিল অনেকগুলি ভেড়া। তারও দুটি ছেলে। চাষী মরে যাওয়ার পর ছেলে দুটি সব কিছু সমান ভাগ করে নিল। ভেড়াও ভাগ হলো। বড় ছেলে নিল পঁয়তাল্লিশটি ভেড়া আর ছোট ছেলে পেল পঁয়ত্রিশটি। ছোট ছেলে বলল,—দাদা, তুমি বেশি নিলে কেন?

বড় ভাই বলল,—তুই তো জানিস প্রত্যেকটি ভেড়ার দাম আট টাকা। আমি যে ক'টা বেশি নিয়েছি তার জন্য তোকে দাম দিচ্ছি। তুই কত পাবি বল্।

চরকাবুড়ী জিজ্ঞাসা করেঃ তোরা বলতে পারিস্, ছোট ভাই কত পাবে?

ছেলেরা একটু ভেবেই বলে ফেলে—আশি টাকা।

না রে না। বুড়ী বলেঃ বড় ভাই তোদের মত অতো বোকা নয় যে, চট্ করে আশি টাকা দিয়ে দেবে। একটু ভেবেচিন্তে বল,—

বেশি ভেড়া নেওয়ার জন্য ছোট ভাইকে সে আট টাকা হিসাবে কত টাকা দেবে।

ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ আরম্ভ করে দিল: এ তো সোজা হিসেব। বড় ভাই নিয়েছে পঁয়তাল্লিশটা আর ছোট ভাই নিয়েছে পঁয়ত্রিশটা। তা হলে ছোট ভাইয়ের চেয়ে বড় ভাই দশটা ভেড়া বেশি নিয়েছে। আট টাকা হিসাবে ছোট ভাই তার দাম আশি টাকাই তো পাবে।

চরকাবুড়ী হেসে বলে,—তোরাও এক একটা হাবারামের ভাই হাঁদারাম। বড় ভাই বেশি নিয়েছে পাঁচটা ভেড়া—দশটা কেন?

ওরা চেঁচিয়ে উঠে বলে: কক্ষনো না। পঁয়ত্রিশ আর দশই তো পঁয়তাল্লিশ—পাঁচ হবে কেন?

শোন্—আমাকে বুড়ো মনে করেই লম্ফ-ঝম্ফ কচ্ছিস তো? তা' আমি বুঝি। আচ্ছা বল, ওরা ওদের বাবার সব কিছুর সমান সমান ভাব পাবে কিনা?

নিশ্চয় পাবে।

বাবার ভেড়া ছিল ক'টা?

ওরা ভাবে। তারপর পঁয়ত্রিশ আর পঁয়তাল্লিশ যোগ করে বলে—আশিটা।

বেশ। সমান দু'ভাগ হলে এক এক ভাগে ক'টা করে ভেড়া পড়ে?

চল্লিশটা।

বড় ভাই নিয়েছিল ক'টা?

পঁয়তাল্লিশটা।

তা হলে বেশি নিল ক'টা?

এবার ওরা লাফিয়ে উঠে বলে—বুঝেছি বুঝেছি। বড় ভাই দেবে চল্লিশ টাকা।

তবে?

বুড়ী স্নতো জড়াতে জড়াতে বলে: আর একটা ভাগ করে দে তো তোরা। তোদের যেমন মোটা বুদ্ধি, তেমনি মোটা জিনিসই ভাগ করতে বলছি।

হাতীর চেয়ে মোটা তো কেউ নেই। হাতীই ভাগ কর। কেবল হাতীই ভাগ হবে কিন্তু। তার বদলে টাকা কড়ি কি অন্য কিছু এনে ভাগ করা চলবে না।

এক দেশে ছিল রাজার এক দেওয়ান। দেওয়ান মরে যাওয়ার আগে তাঁর তিন ছেলেকে সমস্ত কিস্তু ভাগ করে দিয়ে গেলেন।

সকলের ভাগই কিন্তু সমান নয়। কথা থাকল, ছোট ছেলে পাবে সব জিনিষের অর্ধেক, মেজ ছেলে তিন ভাগের ভাগ আর বড় ছেলে, যে বেশ উপায় করতে শিখেছে—সে পাবে ন' ভাগের এক ভাগ।

সব জিনিস ভাগ হলো; কিন্তু হাতী আর ভাগ করা যায় না। দেওয়ানের হাতী ছিল সতরটা। কি ভাবে ভাগ করা যায়, বল দেখি তোরা?

ওরা তুলোর বীচি ছাড়ায় আর ভাবে। কিন্তু সতরকে দু'ভাগ করা যায় না, তিন ভাগ করা যায় না, আবার ন' ভাগও করা যায় না।

মহা মুস্কিল।

হাঁ, মুস্কিল তো বটেই। তাই তো রাজা মশাই নিজে এসে ভাগ করে দিয়ে গেলেন।

রাজা কি করে ভাগ করলেন?

তোরা পারলিনে তো? তবে শোন্ঃ

রাজা সব শুনে হাতীর পিঠে উঠে এসে নামলেন দেওয়ানের বাড়ীতে। ওদের সতরটা হাতী সাজানোই ছিল এক ধারে। রাজা তাঁর নিজের হাতীটাও রেখে দিলেন সেই সঙ্গে।

আঠারটা হাতী হ'ল এবার। রাজা বললেন,—ভাগ কর। মন্ত্রী রাজার কানে কানে বলল, মহারাজ, আপনার নিজের হাতীটাও কিন্তু ভাগ হয়ে যাচ্ছে ঐ সঙ্গে। শুনে রাজা একটু হাসলেন।

ভাগ করে কে ক'টা হাতী পেল বল তো তোরা?

ছেলেদের একজন চট করে বলে দিল—ছোট ছেলে পেল নয়টা, মেজছেলে ছয়টা আর বড় ছেলে পেল দুইটা।

আর রাজা বুঝি নিজের হাতীটাও ভাগ করে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী গেলেন?

ওরা অবাক হ'য়ে বলে—না তো, ভাগ করে দেওয়ার পর রাজার হাতী তো থেকেই গেল।

অগ্নি-পরীক্ষা

এক যে ছিল লোক। সে আলসের হদ্দ। একদিন একটা মোষের পিঠে শুয়ে শুয়ে সে চলছে ত চলছেই। হঠাৎ সে পড়ে গেল এক খেজুর তলায়। তলাটায় বেশ ছায়া। সে চিৎপটাং হ'য়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল। আঃ কী আরাম!

একটা পাকা খেজুর এসে পড়ল তার গোঁফের উপর। তার ইচ্ছা খেজুরটা খায়; কিন্তু হাত দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে দেওয়া তো এক শ্রমসাধ্য ব্যাপার! কে আর তা করে! সে শুয়েই রইল।

একটা লোক যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। অলস লোকটি তাকে দেখে বলল,—ভাই রে, এই খেজুরটা গোঁফ থেকে যদি আমার মুখের মধ্যে দিয়ে যেতে!

লোকটা ছিল রাজার পেয়াদা। সে রাজামশায়কে গিয়ে বলল,—মহারাজ, একটা গোঁফ খেজুরে দেখে এলাম। এমন অলস লোক আমার জীবনে দেখিনি।

সব কথা শুনে রাজা বললেন,—তাই নাকি! এমন অলস আমার রাজ্যে আর কতগুলি আছে একবার তো দেখা দরকার।

রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন,—একটা আলসেখানা তৈরি হয়েছে রাজবাড়ীর মাঠে। যেখানে যত সত্যিকারের আলসে আছ, এসে আশ্রয় নাও।

অমনি দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করল। চাষী তার লাঙ্গল ফেলে এলো, মুটে তার মোট ফেলে এলো, তাঁতী তার তাঁত ফেলে এলো।

আলসেখানায় কেবল খাও আর ঘুমোও। এমন আরাম পেলে লোকে কাজ করতে যাবে কেন ?

রাজা প্রকাণ্ড এক আটচালা ঘর তৈরি ক'রে দিলেন রাজ-বাড়ীর বাইরে। দেখা গেল, পিল পিল করে রাজ্যসুদ্ধ লোক

ঢুকছে সেই আলসেখানায়!

এক বন্ধু এসে জিজ্ঞাসা করল রাজাকে,—মহারাজ, এ আপনি কি করছেন? রাজ্যের কেউই যে আর কোন কাজই করছে না!

রাজা গালে হাত দিয়ে ভাবেন: আমার রাজ্যের সব লোকই দেখছি অলস।

বন্ধু বলেন,—না মহারাজ, ওদের হাজারে একজন অলস কিনা বলা যায় না। ওরা সব সুবিধাবাদী। বাড়ীতে হাট বাজার করার হাঙ্গামা। তাই অনেকেই বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া চালাবার জন্যে এখানে এসে জুটেছে! এরপর আপনার আরও কয়েকটা আলসেখানা খুলতে হবে।

রাজা জিজ্ঞাসা করেন, কেন?

মেয়েরাও কি আর ঘরসংসার, রান্নাবান্না করবে ভেবেছেন? তারাও এসে জুটবে আলসেখানায়।

রাজা ভাবেন,—তাই তো! তাহ'লে এখন কি করা যায়? আমি যে কথা দিয়েছি, আলসেখানায় ওদের জায়গা দেবো।

কারা জায়গা পাবে?

যারা সত্যিকারের অলস তারা।

বেশ কথা। যারা সত্যিকারের অলস কেবল তাদেরই রাখুন, আর সকলকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করুন। তারা খেটে খাক্।

রাজা বলেন,—কিন্তু কি করে বুঝব কে সত্যিকারের অলস, আর কে নয়?

মহারাজ যদি আমার উপর ভার দেন, আমি বের করে দিতে পারি—ওদের কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা মেকী।

বেশ, তাই দাও।

বন্ধু পরদিনই আলসেখানার আটচালা ঘরে দিল আগুন লাগিয়ে। আর অমনি হুড়দাড় করে যত আলসে ছিল সব দিল দৌড়।

কিন্তু দু'জন আলসে শুয়েই থাকল—তারা আর ওঠে না। ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে, তারা কিন্তু নিশ্চিন্তি মনে শুয়েই আছে!

কিছুক্ষণ পরে ওদের একজন অপরকে বলল,—রবি কেন জ্বলে? অপর জন খুব আস্তে উত্তর করল,—কেবা আঁখি মেলে। আবার সে বলল, গায়ে তাপ লাগে। অপর জন মিন মিন করে বলল,—আরাম কর আগে।

কিন্তু আরাম পাওয়ার আগেই সে উঠে বসল। চারদিকেই আগুন। তার ভয় হয়ে গেল। পড়ি মরি করে সে পুড়তে পুড়তে ছুটে পালাল।

অপরজন কিন্তু তখনও নির্বিকার।

লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে এল।

রাজা দেখলেন,—ঐ একটি মাত্রই আলসে আছে তাঁর রাজ্যে।

মুড়ি মিছরির একদর

চরকাবুড়ী অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি! তোরা তা হলে শিগগির পালা এদেশ ছেড়ে।

কেন?

জানিস্ নে? যে দেশে মুড়ি-মিছরির একদর, সে দেশে কখনও বাস করতে নেই।

কেন?

তবে একটা গল্প শোন্—

এক গুরুদেব আর তাঁর শিষ্য। কত নদী, পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে কত পথ হেঁটে উপস্থিত হলো তারা এক দেশে।

কোন্ দেশে?

ঐ তো তোদের আজকালকার ছেলেদের দোষ। সব কথার মধ্যে ফুটকি কাটবি।—সে দেশের নাম তোদের ভূগোল বইতে নেই। তোদের ভূগোলওয়ালারা সে দেশের নাম জানেই না! সেটা হচ্ছে হবুচন্দোর রাজার দেশ—

তারপর?

গুরু শিষ্য তখন দুজনেই খুব ক্ষুধার্ত। এক গাছতলায় বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে বললেন,—দু'আনার মুড়ি কিনে আনো, খাওয়া যাক্।

শিষ্য বাজারে গিয়ে দেখে, সব জিনিষেরই এক আনা সের। তা দেখে আহ্লাদে আটখানা। সে বুদ্ধি করে এক আনায় এক সের মুড়ি আর এক আনায় এক সের মিছরি কিনে আনল।

দূর।—যত সব গালগল্প। এক আনায় আবার এক সের

মুড়ি পাওয়া যায় নাকি ?

যেত রে যেত। সে তোদের ঠাকুর্দার আমলের কথা। তখন একটা পাঁঠার দাম ছিল চার আনা, দশ সের দইয়ের দাম ছিল ছ' আনা। ছু'আনায় একটা টাট্‌কা ইলিশ মাছ পাওয়া যেত।

তারপর ?

গুরুদেব মুড়ি-মিছরির একদর শুনে শিষ্যকে বললেন,—

এক্ষুনি চল পালাই এদেশ ছেড়ে। এখানে আর এক দণ্ডও থাকা চলবে না।

শিষ্য তো অবাক! সে বড় আশা করে ছিল যে, গুরুদেব এখানে কিছুদিনের জন্য আস্তানা গাড়বেন। সে দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, এ জায়গা ছেড়ে যাবেন কেন গুরুদেব? গুরু বললেন,—বিপদ হতে পারে। সমূহ বিপদ। এমন কি প্রাণও যেতে পারে।

শিষ্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উত্তর করল, কত কত দেশ তো ঘুরলাম কিন্তু এমন আজব দেশ তো দেখিনি কোথাও? এখানে সন্দেশ খাও, রসগোল্লা খাও, ছানা খাও—সব একদর। এই দেশেই আমি থাকতে চাই গুরুদেব। আপনার মন না হয় চলে যান—আমি কিন্তু ছাড়ছি না এদেশ। এখানেই আমি থাকব।

গুরু বললেন,—থাকতে চাও থাকো, কিন্তু বিপদে পড়লে আমার দোষ দিও না।

এই বলে গুরুদেব হনহন করে রওনা দিলেন, আর এক

মুহূর্তও দাঁড়ালেন না সেখানে।

শিষ্য মহা আরামে ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা খেয়ে খেয়ে ছ' মাসের মধ্যে খুব মোটাসোটা হয়ে পড়ল। সে বুঝতেই পারে না, গুরুদেব এমন মজার দেশ ছেড়ে পালালেন কেন!

কিছুদিন পরে সেই রাজ্যে এক পাঁচিল পড়ে গিয়ে রাস্তার একটি বুড়ো লোক মারা গেল। ঐ লোকটির ছেলে এসে নালিশ করল রাজার কাছে,—মহারাজ, অমুকের পাঁচিল ভেঙ্গে পড়ে আমার বাবা মারা গেছেন। তার বিচার করুন।

রাজা তখনই ধরে আনলেন যার পাঁচিল তাকে। বললেন, তুমি একজনকে মেরেছ, অতএব তোমাকেও মরতে হবে—এ রাজ্যের বিচার বড় সূক্ষ্ম। তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

লোকটি হাত জোড় ক'রে বলল, মহারাজ, পাঁচিল তো আমি নিজের হাতে তৈরি করিনি, করেছে রাজমিস্ত্রী।

রাজা বললেন,—ঠিক ঠিক। ধরে আনো রাজমিস্ত্রীকে।

রাজমিস্ত্রী এসে বলল, মহারাজ, ঐ লোকটি মারা গেছে ইট চাপা পড়ে। দোষ ইটের। যে ইট তৈরি করেছে সে ঠিক মত ওটা পোড়ায়নি তাই পাঁচিল ভেঙ্গে পড়েছে।

রাজা বললেন,—ঠিক ঠিক! ধরে আনো যে ইট তৈরি করেছে তাকে।

ইটওয়ালা এলো। রাজা বললেন, তোমাকে শূলে দেবো। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই। ইট যে ভালো পোড়া হয়নি, সে দোষ কাঠের। অতএব যে কাঠ দিয়েছে, তাকেই তলব করা হোক্।

রাজা বললেন,—ঠিক ঠিক! যে কাঠ দিয়েছে, ধরে আনো তাকে।

একটি হাড্ডিসার, রোগা চিমটে লোককে ধরে আনা হলো বন থেকে। সে খুব গরীব। কাঠ বেচে খায়। সে ভয়ে ঠক্-

ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। মুখ দিয়ে তার কোন কথা বেরল না।

রাজা হুকুম দিলেন,—একে শূলে দাও। পাইক বরকন্দাজ তাকে ধরে নিয়ে গেল শূলে দেবে বলে।

কিছুক্ষণ পরে জল্লাদ এসে নিবেদন করল,—মহারাজ লোকটি এতই চিমসে যে, শূলে যাওয়ার অযোগ্য। তার গায়ে একরত্তিও মাংস নেই। শূলের মাথায় চড়ালে, দেহটা নিচে নেমে আসবার মত ওজনও নেই তার।

রাজা হুকুম করলেন, এখনই একজন মোটাসোটা লোককে নিয়ে এস।

রাজার লোক ছুটল। শিষ্য তখন এক গাছতলায় বসে মনের আনন্দে রসগোল্লা খাচ্ছে। রাজার লোকেরা তাকে বেশ মোটাসোটা দেখে ধরে নিয়ে এল রাজ-দরবারে। জল্লাদ তাকে ভালো করে দেখে বলল, মহারাজ, এই লোকটিই শূলে যাওয়ার বিশেষ উপযুক্ত।

রাজা বললেন,—দাও একে শূলে।

শিষ্য কিছুই জানে না,—কেন তাকে শূলে দেওয়া হবে। সে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল। কিন্তু রাজার হুকুম কান্নায় রদ হবার নয়। সূক্ষ্ম বিচারে শূলে তাকে যেতেই হবে।

শিষ্যের তখন গুরুদেবের কথা মনে হলো। তিনি বলেছিলেন, —সমূহ বিপদ—এমন কি প্রাণ বিপন্নও হতে পারে এ দেশে। তাই তো হল। হায়, হায়, কেন তখন তাঁর কথা শুনিনি।

ঠিক সেই দিনই সেই দেশের ভিতর দিয়ে গুরুদেব ফিরছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হ'ল শিষ্যটি কেমন আছে দেখে যান।

শিষ্যকে যখন শূলে দেবে ব'লে নিয়ে যাচ্ছে, তখন পথে দেখা হ'ল গুরুর সাথে। শিষ্য তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বলল,—গুরুদেব, এই মহাবিপদ থেকে আমায় রক্ষা করুন। জীবনে কখনও লোভের বশীভূত হ'য়ে আপনার কথার অবাধ্য হবো না।

গুরুদেব সব কথা শুনে জল্লাদকে থামিয়ে ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি তপস্বী। তপস্যা দ্বারা জানলাম,—আজ শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী, বৃহস্পতিবার—মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ মাস। আজকের দিনে যে শূলে যাবে তার সশরীরে স্বর্গবাস। সে ইন্দ্রপুরীতে বাস করবে। তাই আমি ছুটতে ছুটতে এলাম। মহারাজ, ঐ লোকটির বদলে আমাকেই শূলে দিন। আমার আজীবন তপস্যা সার্থক হোক্!

রাজা চিন্তা করে বললেন,—তাই নাকি! এমন কথা শাস্ত্রে লেখা আছে?

নিশ্চয়। আজকের এই মহাপুণ্য দিনে যে শূলে যাবে তার অনন্ত স্বর্গবাস।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, এমন সুযোগ আমি ছাড়তে চাইনে—আমাকেই শূলে দেওয়া হোক্।

রাজা বললেন,—আমাকে তুমি বোকা পেয়েছ নাকি মন্ত্রী! আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি স্বর্গে যাবে! শূলে আজ আমিই যাবো।

মহারাজ, আমার স্বর্গে যাওয়ার উপায় কি হবে তা হ'লে? মন্ত্রী করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল। গুরুদেব বললেন,—মহারাজ, ত্রয়োদশী তিথি আর বড় বেশিক্ষণ নেই, আমাকেই শূলে দেওয়ার আদেশ দিন।

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, মন্ত্রী, তুমিও আমার সঙ্গে স্বর্গবাস করতে চাও?—আচ্ছা, এক্ষুনি আর একটা শূল নিয়ে এস তা হলে।

রাজা আর মন্ত্রী উভয়েই শূলে গিয়ে চাপলেন। চারদিকে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল।

গুরুদেব শিষ্যকে নিয়ে সেই হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে দিলেন ছুট্। ফিরেও তাকালেন না সে-দেশের দিকে আর।